১৯৫৬ পরবর্তী পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

1956 POROBORTI PURULIA JELAR NIRBACHITO JONOJATIR BIBORTON O SANSKRITIK UTTORADHIKAR

Synopsis of the proposed research work for Ph.D degree
Submitted to the Department of Bengali

Binod Bihari Mahto Koylanchal University, Dhanbad

গবেষক (Researcher)

স্বপন কুমার

Swapan Kumar

তত্ত্বাবধায়ক (Supervisor)

ড. শর্মিষ্ঠা আচার্য

Dr. Sarmistha Acharyya

H.O.D, DEPARTMENT OF BENGALI
SINDRI COLLEGE, SINDRI, DHANBAD

কথামুখ

Preface

পুরুলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন মানবজাতি হল এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি। যারা নিজেদের আদিমতায় সাজিয়ে রেখেছে মানভূমি সভ্যতাকে। পুরুলিয়ার আসল পরিচিতি এখানকার আদিবাসী ও তাদের জীবনচর্চায় প্রতিফলিত সংস্কৃতি। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানভূমের মানুষের উন্নতি হলেও এখানের আদিবাসীরা থেকে গেছে সেই অ-শিক্ষার অন্ধকারে। এখনও দুবেলা খাবারের সন্ধানে অতিবাহিত হয় সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে জনজাতি সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনারও বিকাশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। জনজাতিগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার বা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা একক ও যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন কর্মসূচি আদিবাসীদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়েছে খুব অল্পই।

আমার জীবনের প্রায় আটাশটি বছর কেটে গেছে পুরুলিয়ার এই আদিবাসীদের সঙ্গে। এই আদিবাসীদের সাথে আমার প্রীতির সম্পর্ক। আদিবাসী জীবন নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ আমার বহুদিনের। যখন "বিনোদ বিহারী মাহতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়"-এ গবেষণার সুযোগ পেলাম তখন ভাবলাম আমার এই পুরুলিয়ার সহজ-সরল মানুষগুলো নিয়ে যদি গবেষণা করতে পায় তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। কারন তাদের সম্পর্কে আমার ধারণার পরিধি আরও বিস্তৃতি পাবে। সেই ভাবনা থেকেই **১৯৫৬ পরবর্তী পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার** শিরোনামাঙ্কিত বিষয়টির চিন্তন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আমাকে ওই বিষয় নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দেন তবে আমি বাধিত থাকব। সর্বোপরি আমি এই কাজটি ডা. শর্মিষ্ঠা আচার্যের তত্ত্বাবধানে করতে চাই। আমার এই অনুরোধও যদি মঞ্জুর করা হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

তারিখঃ

গবেষকের স্বাক্ষর

স্বপন কুমার

সূচিপত্র

বিষয় সূচি

ভূমিকা (Introduction)

১) প্রাথমিক সাহিত্য পর্যালোচনা (Primary review of litareture)

২) সমস্যার অনুসন্ধান (Problem to be investigated)

৩) গবেষণার লক্ষ্য (Object of the research)

৪) পূর্বানুমান (Hypothesis)

৫) গবেষণা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (Research desi gn and methodology)

৬) তথ্য সন্ধান ও ব্যাখায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ (Tools to be used in the data and analysis)

৭) সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব (Significance of proposed work)

৮) গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Research limitation and future work)

৯) সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative chapterization)

১০) গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

ভূমিকা : (Introduction)

মানব সমাজের চিরকালীন ঐতিহ্যের ধারক হল আদিম জনজাতি। রাজনীতি কোন দেশের মানচিত্রকে বিভাজন করে দিলেও প্রকৃতি কিন্তু কখনোই হৃদয়হীন হতে পারে না। প্রকৃতি তার আঁচল পেতে আশ্রয় দিয়েছে এই আদিম জনজাতিকে। ভারতের আদিম জনজাতি হিসেবে নথিবদ্ধ আদিম জনজাতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আজও নিজ ঐতিহ্য বজায় রেখে বিদ্যমান। আলোচ্য মানভূম জেলাতেও অনেক জনজাতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। তারাই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে জুড়ে রেখেছেন। শিকড়ের সাথে প্রথিত করেছেন। সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে এই সব আদিম জনজাতির জীবন চর্চা, ভাষার পরিবর্তন লক্ষিত হয়। আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যে আলোচ্য মানভূম জেলার নির্বাচিত আদিম জনজাতির রূপরেখায় সেই শিকড়ের সন্ধান ও

বিবর্তনকেই অনুসন্ধানের চেষ্টা থাকবে।

প্রাথমিক সাহিত্য পর্যালোচনা: (Primary review of literature)

এই জেলাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে অনেক গবেষণা হচ্ছে এবং আগামীদিনেও এই বিষয়ে ভাটা পড়বে না। পূর্বের গবেষণাগুলোতে লোকসংস্কৃতি, কথাসাহিত্য ও কবিতা প্রভৃতি বিষয় দেখা যায়। কিন্তু এই জেলার যারা ধারক ও বাহক আদিম জনজাতির কথা ব্যক্ত হয়নি। ফলে আদিম জনজাতিগুলোর জীবনচিত্র এক অন্ধকারেই রয়ে গেছে। আর এই স্থান থেকেই '১৯৫৬ পরবর্তী পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর করে। পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মগুলিতে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হল-

১। গবেষক অনিমেষ ব্যানার্জি সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "বাংলা কথাসাহিত্যে পুরুলিয়া: সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা" নামে একটি গবেষণা করেছেন। এই গবেষণ কর্মে সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রসঙ্গ থাকলেও নির্দিষ্ট কোনো জাতিকে মূল প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসেননি।

২। গবেষক ভীমসেন মাহাতো বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "মানভূমের ভাষা একটি সার্বিক সমীক্ষা" নামে একটি গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা কর্মে মানভূমের ভাষা, মানভূমের ভাষা আন্দোলন, বিভিন্ন জনজাতির ভাষার কথা ব্যক্ত করেছেন।

৩। গবেষক চণ্ডীচরণ মুড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "পুরুলিয়া লোকসংস্কৃতি" নামে একটি গবেষণা করেছেন। সেখানে তিনি পুরুলিয়া জেলার ঐতিহ্য টুসু, ভাদু, ছৌ, ঝুমুর সম্পর্কে বেশ আলোকপাত করেছেন, এছাড়াও কিছু কিছু জনজাতির কথাও প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। গবেষক সংগ্রাম মাহাতো বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "পুরুলিয়া জেলার লোক উৎসবে নারী" নামে একটি গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা কর্মে উঠে এসেছে উৎসবের প্রেক্ষাপটে নারীর ভূমিকা কতখানি, তার সার্বিক দিক। উৎসবের রীতিনীতি, উৎসবের প্রকারভেদ, উৎসবে সাধারন মানুষের ভূমিকা কতখানি- তা বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এই সমস্ত প্রাথমিক সাহিত্যিক পর্যালোচনা ও গভীর অধ্যয়নের পর মনে হয়েছে **১৯৫৬ পরবর্তী মানভূম জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার** বিষয়টির সম্ভাবনা রয়েছে বিস্তারিত আলোচনার। যার ফলে পাঠকমহলে এই জেলার সাহিত্যে জনজাতিগুলোর ভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হবে।

সমস্যার অনুসন্ধান: (Problem to be investigated)

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। সেগুলি হল নিম্নরূপ-

১) পুরুলিয়ার ভৌগোলিক পরিচিতি।

২) পুরুলিয়ার জনজাতির পরিচিতি।

৩) পুরুলিয়ার কথ্যভাষা।

৪) পুরুলিয়ার লোকশিল্পের সেকাল ও একাল।

৫) পুরুলিয়া জেলার লোকসাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অবদান।

গবেষণার লক্ষ্য : (Object of the Research)

১৯৫৬ পরবর্তী পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

গবেষণা কর্মটিতে আমরা মুখ্য কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করব সেগুলো হল-

১। এই জেলার ভৌগোলিক পরিসরের পরিচয়।

২। নির্বাচিত জনজাতিগুলোর উৎস থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জীবনযাপনের পর্যালোচনা।

৩। নির্বাচিত জনজাতিগুলোর লোকসাহিত্যের ধারার পরিচয়দান।

৪। নির্বাচিত জনজাতিগুলোর কথ্যভাষার বিচিত্রতা দান।

৫। নির্বাচিত জনজাতিগুলোর লোকসংস্কৃতির পরিচয়।

পূর্বানুমান : (Hypothesis)

আমার গবেষণা সন্দর্ভ **১৯৫৬ পরবর্তী পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার** বিষয়টিতে জাতিগুলোর বিবর্তনের ধারা উঠে আসবে। এই গবেষণা কর্মে জনজাতিদের জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়াও বর্তমান সময়ে তাদের সম্পূর্ণ জীবনচিত্র প্রতিফলিত হবে। পাঠক অবগত হবে আদিম জনজাতিদের জীবন দর্শন, আচার-আচরণ, নিজস্ব লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির ধারার বিবর্তন।

<u>গবেষণা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি</u>: (Research design and methodology)

১৯৫৬ পরবর্তী পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কয়েকটি অধ্যায় বিভাজন করে বিষয়টিকে আলোচনা করব।

সমস্ত গবেষণা কর্মটি ক্ষেত্র সমীক্ষা ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে আলোচিত হবে। যে সমস্ত অধ্যায় বিভাজন করে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি আলোচিত হবে সেগুলি হল-

প্রথম অধ্যায়	পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক পরিচয় Purulia Jelar Vougolik Porichoy
দ্বিতীয় অধ্যায়	পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন জনজাতি (নির্বাচিত)-র পরিচয় Purulia Jelar Bivinno Jonojati (Nirbachito)-r Porichoy
তৃতীয় অধ্যায়	পুরুলিয়া জেলার সাহিত্যচর্চায় লোকসাহিত্যিকদের অবদান Purulia Jelar Sahityachorchay Lokosahityikder Abodan
চতুর্থ অধ্যায়	পুরুলিয়ার জনজাতি-ভিত্তিক লোকশিল্প ও সংস্কৃতির বিবর্তন Puruliar Jonojati-Vittik Lokosilpo o Sonskritir Biborton
পঞ্চম অধ্যায়	পুরুলিয়ার কথ্যভাষা: সময়ের ছন্দে Puruliar Kothyovasa: Somoyer Chonde

তথ্য সন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুসঙ্গ: (Tools to be used in the collection of data and analysis)

সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি ক্ষেত্র সমীক্ষা ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে জনজাতিগুলির ক্ষেত্র সমীক্ষা করব। তারপর পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। সমগ্র পরিকল্পনায় বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাক্ষাৎকারের জন্য আমরা পূর্বেই প্রশ্নসূচি তৈরি করে রাখব। তাছাড়া প্রয়োজন অনুসারে ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া হবে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পর অভ্র সফটওয়্যারে কালপুরুষ ফন্টে তা মুদ্রিত হবে।

সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব : (Significance of the proposed work)

সমকালীন প্রেক্ষাপটে **১৯৫৬ পরবর্তী পুরুলিয়া জেলার নির্বাচিত জনজাতির বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার** বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। কমবেশি আমরা জানি জনজাতি সম্পর্কে প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপে কোনো গবেষণা হয়নি। বর্তমান সময়ে যে বিষয়গুলো উঠে আসবে-

১। সাহিত্যে জনজাতিদের প্রতিফলন কতখানি ঘটেছে, তাদের যাপিত জীবন ও জীবনশৈলীর নানান দিক অনুসন্ধান করা আমার গবেষণা কর্মের একটি প্রধান বিষয়।

২। আমার গবেষণা কর্মের বিষয় নিয়ে এর পূর্বে সার্বিক গবেষণা হয়নি। তাই পরবর্তীকালে এই গবেষণাকর্ম ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে ধরে রাখবে, যা গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩। আমার গবেষণাকর্মটির সামাজিক অবদান সবথেকে বেশি। সমাজে জনজাতিদের অবস্থান মূল্যায়ন করা, সমাজ চিত্রের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত করা, লোকায়ত জনজীবন প্রভৃতি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সমীক্ষা ভিত্তিকভাবে আমার গবেষণা কর্মে উঠে আসবে। তাই এই গবেষণাকর্মের সামাজিক মূল্য অপরিসীম।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : (Research limitation and future work)

এই জেলায় আদিম জনজাতিদের সংখ্যা অনেক। তবে গবেষণা কর্মের সুবিধার্থে নির্বাচিত কিছু জনজাতি অর্থাৎ সাঁওতাল, বীরহোড়, শবর, ভূমিজদের নিয়ে সার্বিক আলোচনা করা হবে। নির্বাচিত জনজাতিগুলোর ছাড়া অন্যান্য জাতিগুলোকে আমরা আলোচনার বাইরে রাখছি। আসলে সময়ের মধ্যে গবেষনা কর্মটি শেষ করতে হবে তার জন্য। প্রধান জনজাতিগুলোকে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক, বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করব। অন্যান্য জনজাতিগুলোকে গবেষণার পরিধি বিচার করে কিছু কিছু বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হবে। এছাড়াও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকেও এই জেলার জনজাতিগুলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে-

১। এই জেলার সমসাময়িক জনজাতিদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির তুলনামূলক অধ্যয়ন।

২। নির্দিষ্ট জাতিকে নিয়ে গবেষণা।

৩। এই জেলার সমগ্র জনজাতির কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করে গবেষণা।

৪। এই জেলার জনজাতির লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা।

৫। এই জেলার জনজাতিগুলোর লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা।

এছাড়াও এই জেলার জনজাতিগুলোর আরও অন্যান্য দিক রয়েছে যেগুলো নিয়ে গবেষণার সম্ভাবনা থেকে যায়।

সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative Chapterization)

ভূমিকা (Bhumika)

প্রথম অধ্যায়	পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক পরিচয় Purulia Jelar Vougolik Porichoy
দ্বিতীয় অধ্যায়	পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন জনজাতি (নির্বাচিত)-র পরিচয় Purulia Jelar Bivinno Jonojati (Nirbachito)-r Porichoy
তৃতীয় অধ্যায়	পুরুলিয়া জেলার সাহিত্যচর্চায় লোকসাহিত্যিকদের অবদান Purulia Jelar Sahityachorchay Lokosahityikder Abodan
চতুর্থ অধ্যায়	পুরুলিয়ার জনজাতি-ভিত্তিক লোকশিল্প ও সংস্কৃতির বিবর্তন Puruliar Jonojati-Vittik Lokosilpo o Sonskritir Biborton
পঞ্চম অধ্যায়	পুরুলিয়ার কথ্যভাষা: সময়ের ছন্দে Puruliar Kothyovasa: Somoyer Chonde

উপসংহার (Conclusion)

তথ্যসূত্র (Reference) :

নির্ধারিত M.L.A ধারা অনুসরন করে তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) :

আকর গ্রন্থ (Primary Source)

সহায়ক গ্রন্থ (Secondary Source)

পত্র-পত্রিকা (Journals)

প্রথম অধ্যায়

পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক পরিচয়

(Purulia Jelar Vougolik Porichoy)

পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হল পুরুলিয়া। এই জেলা মেদিনীপুর বিভাগের চতুর্থ বৃহত্তম জেলা। পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে অবস্থিত পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে পূর্বে ৮৬°৫৪' পূর্ব, দক্ষিণে ২২° ৪৩', উত্তর অক্ষাংশ থেকে উত্তরে ২৩° ৪২', পশ্চিমে ৮৫° ৪৯' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই জেলা। পুরুলিয়া জেলার মোট ভৌগোলিক আয়তন হল ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার। গঠনগত দিক থেকে এই জেলার ভূপ্রাকৃতিকের মূল বৈশিষ্ট্য হল নিচু উপত্যকা, উচ্চ পাহাড়-চূড়া এবং বন্ধুর ভূমিভাগ। এখানে উচ্চ পাহাড় ও নিচু সমতলের পার্থক্য অবশ্যই দেখা যায়। তবে এই জেলার অধিক স্থান হল সমভূমি। এই জেলার পশ্চিম মালভূমির সর্বোচ্চ অংশ হল অযোধ্যা পাহাড়, দক্ষিণে দলমা পাহাড়, বেলামু পাহাড় এবং পূর্বের পাঞ্চেত পাহাড়ও এই সারিতেই পড়ে। অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গর্গাবুরু এই জেলায় অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিক বন্টন অনুযায়ী এই জেলাকে তিন ভাগে বিভাজন করা যায়। যথা-

১| পাললিক সমভূমি।

২| বিচ্ছিন্ন শিলাস্তুপ ও ল্যাটেরাইট উচ্চভূমি।

৩| দক্ষিণ-পশ্চিম বন্ধুর পাহাড়ি অঞ্চল।

এই জেলাতে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বিরাজ করে। এখানে গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা হয় সর্বোচ্চ ৪৫° সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬° সেন্টিগ্রেড। শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ২৮° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন ৮° সেন্টিগ্রেড। তবে মাঝেমধ্যে তাপমাত্রার হেরফের হয়। বর্ষাকালে আপেক্ষিক আদ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং শীতকালে তা হ্রাস পায়।

এই জেলাতে বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হল ১০০০-১৪৫০ মিলিমিটার। এই জেলার মাটি হয় নানান ধরনের- কোনো কোনো জায়গায় পাথরে মাটি আবার অনেক জায়গা জুড়ে বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, দোঁয়াশ মাটিও দেখা যায়। এখানকার মানুষ মাটি অনুযায়ী চাষবাস করে। বর্ষাকালে অধিকাংশ জায়গাতেই ধান চাষ হয় এবং শাকসব্জি চাষ প্রায় বারোমাসই হয়। শীতকালীন শাকসব্জি এখানে অধিক মাত্রায় দেখা যায়। এই জেলাতে দেখা যায় ক্রান্তীয় অরণ্য। এই অরণ্যের মধ্যে চোখে পড়ে- পলাশ, শাল, মহুয়া, জাম, আম, শিমুল, অর্জুন, সেগুন, আমলকি, হরিতকি, নিম, বাঁশ ইত্যাদি গাছ। এখানকার উল্লেখযোগ্য নদনদীগুলি হল সুবর্ণরেখা, দামোদর, কুমারী, কংসাবতী ইত্যাদি। প্রায় অনেক নদীর গতিপথ পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্বগামী। কংসাবতী নদী হল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমগামী। এই নদীর বুকে বান আসে বর্ষা মাসেই। এই জেলার প্রধান নদী হল কংসাবতী বা কাঁসাই। কোটশিলা থানার অন্তর্গত জাবর পাহাড় থেকে এই নদী উৎপন্ন

হয়ে দক্ষিণ-পূর্বে বয়ে চলেছে। এই নদীর প্রধান উপনদী হল কুমারী নদী। বাগমুন্ডি পাহাড়ের কাছাকাছিতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কুমারী নদী। এছাড়াও কংসাবতীর উপনদীগুলি হল বান্ধু নদী, সাহারা জোড়, চাকনা নদী, তেরে নদী, হোবরি জোড় ইত্যাদি। এই জেলাতে মোট ব্লকের সংখ্যা কুড়িটি। সেগুলি হল- বাঘমুন্ডি, বলরামপুর, ঝালদা ১, ঝালদা ২, আড়ষা, মানবাজার ১, মানবাজার ২, পুরুলিয়া ১, পুরুলিয়া ২, বান্দোয়ান, হুড়া, পুঞ্চা, পাড়া, রঘুনাথপুর ১, রঘুনাথপুর ২, কাশীপুর, নিতুড়িয়া, সাঁতুড়িয়া, জয়পুর, বরাবাজার। এই জেলার উল্লেখযোগ্য শহরগুলি হল বলরামপুর, ঝালদা, কাশীপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি।

পুরুলিয়া শহরের পূর্বে বাঁকুড়া, পশ্চিমে ঝাড়খন্ড রাজ্য, উত্তরে বর্ধমান এবং দক্ষিণে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর। এর মোট আয়তন হল ১৪ বর্গ কিলোমিটার। এই শহরটির অবস্থান হল দ্রাঘিমাংশ ৮৬.৩৭° পূর্ব এবং অক্ষাংশ হল ২৩.৩৩° উত্তর। শহরটি সমুদ্র সমতলের থেকে ২২৮ মিটার উচ্চে অবস্থিত। এখানকার স্বাক্ষরতার হারও বেশ ভালো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন জনজাতি (নির্বাচিত)-র পরিচয়

(Purulia Jelar Bivinno Jonojati (Nirbachito)-r Porichoy)

ভারতবর্ষের আদিম জনজাতি সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির অংশবিশেষ। এই দেশের আদিবাসীকে নৃতাত্ত্বিকেরা বিজ্ঞানসম্মত পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা মনে করেন আদি অস্ট্রালরাই ভারতের আদিম জাতি। কারন অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনজাতির সঙ্গে ভারতের আদি অস্ট্রালদের দেহের গঠনগত মিল আছে। আদি অস্ট্রাল জাতি দেখতে অনেকটাই খর্বাকৃতি, নাক চ্যাপ্টা ও চওড়া, রং কালো, মাথার চুলগুলো ঢেউ খেলানো। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসীরা প্রটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর মানুষ। যেমন মুন্ডা, কোল, ভীল, কোরোয়া, ভূমিজ প্রভৃতি জাতি হল এই গোষ্ঠীর। স্বভাবতই কোল বলতে বোঝায় সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, হো প্রভৃতি জাতিকে। মধ্যযুগের সাহিত্যে রয়েছে কালকেতু, ফুল্লরা প্রাচীন অস্ট্রিক সমাজের সদস্য। ব্যাধ, নিষাদ, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি জাতির উল্লেখ পায় মধ্যযুগের সাহিত্যে-এরা হল আদি অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মানভূম তথা পুরুলিয়ার অনেক জনজাতি রয়েছে কিন্তু বর্তমানে যে কয়েকটি জনজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান, আলোচ্য অধ্যায়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শবর বা খেড়িয়া :

প্রাচীনকাল থেকে কিছু মানুষ অরণ্যের ভিতরে, লোকচক্ষুর আড়ালে, বর্ষা মাস বাদ দিয়ে প্রায় যাযাবর জীবনযাপনে অভ্যস্ত, বালাইহীন পোশাক-পরিচ্ছদ, বনজ সম্পদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, সম্ভবত হাজার পনেরো পুরুলিয়া জেলার মধ্যে কিছু জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যারা ব্রিটিশদের কাছে 'অপরাধপ্রবণ' হিসেবে চিহ্নিত, একসময় যারা শোষিত, নিন্দিত, পীড়িত-সেই অরন্যপ্রিয় কঠোর পরিশ্রমী, শিকার প্রেমী, সেই আদিম আদিবাসীদের নাম শবর আবার মতান্তরে যাদের বনদিগার, খেইড়া বা খেড়িয়া নামে পরিচিত।

শবরেরা অরণ্য পরিবেশে লোকালয় থেকে দূরে বসবাস করতেই পছন্দ করে। তাদের নিজের জমিজমা নেই, কৃষিকাজ জানে না, শ্রমিকের কাজও তারা করে না। ফলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তারা বেঁচে থাকে কিভাবে? এর উত্তর নিহিত আছে তাদের খাদ্য প্রণালীর ওপরই। তাদের খাদ্যপ্রণালীটিকে যদি আমরা কয়েকটি ভাগে বিভাজিত করে আলোচনা করি তাহলে তাদের জীবন অনেকটাই আমাদের কাছে চিত্রিত হবে। যেমন বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ- আষাঢ় এই তিন মাস এরা বনজঙ্গলের ফলমূল, পাখির বাচ্চা, ঢ্যামনা সাপ, গোইসাপ, ব্যাঙ, শামুক প্রভৃতি খেয়েই জীবনযাপন করে। সাপের গর্ত দেখেই বুঝতে পারে কোন গর্তে সাপ আছে কি না? ঢ্যামনা সাপ হল বেশ লম্বা, শবরদের গায়ের গন্ধ পেলেই এই সাপগুলো নেতিয়ে পড়ে কেঁচোর

মতো। ঢ্যামনা সাপ শিকারে পেলে এরা খুব খুশি হয়। এই সাপের ছালকে বিক্রি করে এবং সাপটিকে আগুনে ঝলসে বেশ আনন্দে খায়। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন- এই তিন মাস এরা খেত থেকে নানা ধরনের ব্যাঙ, বড় বড় শামুক, ঘঙ্গা, নদী থেকে কাঁকড়া সংগ্রহ করে এবং এগুলো খেয়েই জীবনযাপন করে। ব্যাঙগুলোকে পাতার খোলার মধ্যে রেখে একটু আগুনে ঝলসিয়ে তৃপ্তি করে খায়। এই খাওয়ার পর্বটি কিন্তু বাইরেই সেরে নেয়, ঘরে রান্নাবান্নার ঝামেলা করে না। কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ এই তিন মাস তারা ধানক্ষেতের আইল থেকে ইঁদুর, ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান সংগ্রহ করে। শবর পুরুষেরা যেমন একাজ করে তেমনি শবর মেয়েরাও এই কাজে বেশ পটু। ইঁদুর বাচ্চাগুলোকে তারা এমনিতেই খেয়ে ফেলে-এতে আগুনের প্রয়োজন হয় না। মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র এই তিন মাস ফল, মধু সংগ্রহ করে দিনাতিপাত করে। এই সময় তারা পশু শিকার করে যেমন শিয়াল, হুড়াল, খরগোশ ইত্যাদি।

শবররা দেখতে ধূসর কালো, শরীরে কোনদিন তেল পড়েনি, তাই তাদের এক প্রকার উৎকট গন্ধ বেরোয় শরীর থেকে। লম্বাতে এরা হয় পাঁচ থেকে ছয় ফুট, মাথা গোল, নাক ছোট চ্যাপ্টা, চোখ ছোটো ছোটো দৃষ্টি চঞ্চল। ঠোঁটের পাতা মোটা, হাত লম্বা ও শক্ত, বুক চওড়া, পেট শরীরের সঙ্গে সাঁটানো, পায়ের পাতা বেশ শক্ত-তাদেরকে দেখলেই মনে হয় ওই শরীরে রয়েছে অসুরের মতো শক্তি।

তাদের ঘরগুলোর পরিকাঠামো দেখলেই মনে হয় তারা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সেগুলো গড়ে তোলেনি। ঘরগুলো ছয় সাত হাত উঁচু, পাঁচ ছয় হাত লম্বা, মাটির দেওয়ালগুলো নড়বড়ে, সামান্য খড় দিয়ে ছাওয়া, দুয়ারগুলো দেড় হাতের,এইরকম দুয়ারে কোনরকম হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে ঘরে ঢুকে তারা। খুব শীতের দিনে ঘরের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে সেখানে খড় দিয়ে রাত অতিবাহিত করে। ঘরের জিনিসপত্র বলতে দুই একটি মাটির ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তাদের জীবন যাপন দেখলেই মনে হয় স্থায়ীভাবে বসবাস তাদের মাথায় কোনকালেই ঘোরাফেরা করে না।

পুরুষদের যেমন সাজপোশাকে কোনরূপ বিলাসিতা নেই, তেমনি নারীদের ক্ষেত্রে লজ্জা নিবারনের যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু কোনো রকমে জোটে। নারীদের অলংকার, সাজসজ্জা বলতে তারা কিছুই বোধ হয় জানে না। পুরুষদেরকে চালনা করে নারীরা। তাদের বুদ্ধি বেশি। তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই জোগাড় করে। এই শবর চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য হল নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত। মেয়েরা কিছু কিছু বাঁশ ও খেজুর পাতার কাজ করে। যেমন বাঁশ

থেকে কুলা, খাঁচি, ঝাঁটা, খেজুর পাতা থেকে চাটাই তৈরি করে হাটে বিক্রি করে।

শবরদের মধ্যে একটি খুব ভালো দিক আছে তা হল ভয়ংকর শরীরের সরল মন। এরা সভ্য সমাজের মানুষকে ভয় করে, ঠিক মতো বিশ্বাস করতে পারে না। আসলে এরাই ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় সৈনিক। ব্রিটিশ পুলিশদের সামনে বুক পেতে দেওয়া, তাদের বন্দুক লুট করা, মদভাঁটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া- এই কাজগুলো শবরেরা করেছিল অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে।

এই সুন্দর মনের মানুষগুলো আজ তাদের চেনাই যায় না। তাদেরকে অরণ্য জঙ্গল ত্যাগ করেছে, এককথায় অরন্যগুলো দিন দিন ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপামর জনগণের সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি সজাগ না হয় তাহলে তারা একদিন হয়তো লুপ্ত হয়ে যাবে আমাদের চোখের সামনে।

ভূমিজ :

মানভূমের প্রায় অনেক গ্রামে ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকবসতি দেখা যায়। তারা আছে বিভিন্ন গ্রামে- যেমন জয়পুর, শিমুলটাঁড়, তুলিন, বেগুনকোদর, ঝালদা, বাগমুন্ডি, পুরুলিয়া, রাঙামাটি, সিরকাবাদ প্রভৃতিতে। মানভূমের আদি বাসিন্দা যে ভূমিজ তার কোনো সন্দেহ নেই। মানভূম যখন গড়ে ওঠেনি অর্থাৎ জঙ্গলমহল থেকেই তারা এখানে বসবাস করে তার প্রমাণ মিলে। এককথায় বলতে গেলে বলা যায় ভূমিজ সম্প্রদায় হল এই জেলার আদিবাসিন্দা।

বর্ণ হিন্দুদের গোত্র চিহ্নিত হয় টোটেমের মাধ্যমে। টোটেম হল গোষ্ঠীর রক্ষক-তা হতে পারে কোন পাখি, প্রাণী বা বৃক্ষ। ভূমিজদের টোটেমের মাধ্যমে গোত্র চিহ্নিত হয়। তাদের গোত্র হচ্ছে কাছিম, হাঁস, স্বামী শুগা ইত্যাদি।

ভূমিজদের উদ্ভবের এক ইতিহাস পরিলক্ষিত হয় প্রায় সকলের মুখেই। কপিলা নামে কোনো এক রাজার গাই ছিল। এই গাইটি পায়ে করে যখন একবার মাটি খুঁড়েছিল তখন ঐ মাটি থেকে উৎপত্তি হয়েছিল ভূমিজেরা। আমাদের মনে হয় জঙ্গলমহলের ভূমির দখল ছিল তাদের এবং চাষবাস করত তারা। ভূমির অধিকারের জন্যই হয়তো তাদের বলা হত ভূমিজ। এদের মধ্যে পদবীগুলো হল সর্দার, সিং মুড়া, মাঝি, মানকি, দিগার, ভূমিজ প্রভৃতি। এদের মধ্যে সমাজে সর্দাররা ছিল উঁচু এবং ঘাটোয়ালরা ছিল নিচু মানের। এইজন্যই তাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হত-

'ঘইটলে ঘাটোয়াল উইঠলে সর্দার।'[১]

এদের মধ্যে যারা বড়লোক তারা সম্মান পেত সমাজে এবং নাচনী রাখতে পারতো।

এরপর আমরা আলোচনা তৎপর হব ভূমিজদের বিবাহ সম্পর্কে। প্রথমে আলোকপাত করব বিবাহ নিয়ে এবং পরে আলোচনায় সচেষ্ট হব সাংঘা সম্পর্কে। তাদের প্রথা মতো বরপক্ষ কনে খুঁজতে যায় তবে বর্তমানে কনেপক্ষ বর খুঁজতে আসে। বরপক্ষ কনের বাড়ি যায়, পছন্দ হলে বলে আর একদিন আসব। আর একদিন গিয়ে দেনাপাওনা ঠিক করা হয়-বরকেই পন দিতে হয়। পনের মূল্য খুব বেশি না, নিজেদের সাধ্যমত হয়। এর মাঝে কোনো এক সময়ে কনেপক্ষ বরপক্ষের ঘরদোর দেখে যায়। তারপর বরপক্ষ যায় লগ্ন ধরাতে-সেটা পাঁচ বা সাত বা তিন দিনের হতে পারে। যতদিনের লগ্ন হবে তত সের তেল, সঙ্গে সঙ্গে সাবান, শাড়ি, ব্লাউজ, কাপড় ইত্যাদি বরপক্ষ নিয়ে যায় কনের ঘরে। ঐদিন থেকেই কনে সেই তেল মাখে বিয়ের দিন পর্যন্ত। আবার সেই তেলের একটু কনেকে স্পর্শ করে নিয়ে আসে বরের ঘর-বিয়ে পর্যন্ত বর মাখে সেই তেল। বিয়ের দিন বরপক্ষ বরযাত্রী নিয়ে কনের বাড়ি যায়। কনের বাবা বরকে নিয়ে ছামড়াতলায় পৌঁছে দেয়। একদিকে চলতে থাকে বরযাত্রীদের ভোজনপর্ব অন্যদিকে চলতে থাকে বিয়ের নানান নিয়মনীতি। পুরোহিতের মাধ্যমে বিয়ে সাঙ্গ হয়। বিদায়ের দিন কনেপক্ষের দুই একজন কিছুদূর আসে এবং বর কনের হাত এক জায়গায় রেখে আঙ্গুলের ফাঁকে একটি তীর ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং বরের উদ্দেশ্যে বলে-

“বন যাবি, শিকার করবি,
পাইখ মারবি হাড় খাবি
মাসটি আইনে দিবি।”[২]

অর্থাৎ যাকে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছ, তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হল। বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। বরের ঘরের লোক আমপাতায় জল ছিটিয়ে বাড়িতে তোলে এবং তারপরের দিন হয় বরপক্ষের ভোজনপর্ব।

এরপর আমরা আলোচনা করব সাংঘার কথা। সাংঘা হয় সাধারনত যেসব নারী বা পুরুষের একবার বিবাহ হয়েছিল তাদের মধ্যে। সাংঘা প্রথা খুব গোপনে গোপনে হয়। কথাবার্তা দু'পক্ষেই ঠিক হলে বর নির্দিষ্ট দিনে চাল, খাসি, তেল মসালা নিয়ে কনের বাড়ি যায়। সেখানে বরের আনা জিনিসপত্র রান্নাবান্না করে সকলেই খায়। এরপর বর কনের মাথায় সিঁদুর দেয়, হাতে পরিয়ে দেয় লোহা। রাত্রের মধ্যেই বিদায় হয়। সমাজ স্বীকার করে নেয় এই বউকে কিন্তু বিবাহ, শুভ অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে তাকে কোনো কিছু স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। আবার

এই সম্প্রদায়ের এমন প্রথাও আছে যে-বড় ভাই মারা গেলে তার বউ দেওরের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করে। 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস' নামক পুস্তকে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই প্রথাকে বলা হয় 'দেবরন প্রথা।'

ভূমিজদের কারুর মৃত্যু হলে পোড়ানো হয় কিন্তু শ্মশানে আগুন নেভানো হয় তিন দিনের দিনে। মৃত ব্যক্তির পুত্ররা জল দিয়ে আগুন নেভার পরে অশৌচ দশদিন পালন করে। মানভূমের ভূমিজদের কথা প্রসঙ্গে অন্তিমে একটা কথা বলতেই হবে তা হল তারা খুব সাহসী, স্বাধীনচেতা মানুষ। স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজা গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে যে সেনারা ব্রিটিশদের সঙ্গে তীব্রভাবে লড়াই করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভূমিজ। যেদিন আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হবে সেদিন ভূমিজদের কথা উৎকৃষ্টতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হবে।

বীরহোড় :

বনলতা দিয়ে জালের ফাঁদ পাতা, পরনে সামান্য এক ফালি কাপড়, আলু থালু চুল, মেদহীন চেহারা, হাতে তীর ধনুক, শিকার জীবনের একটি অংশ, জীবন ধারণের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের থেকে আলাদা, সংখ্যায় খুব বেশি নেই-এরাই হচ্ছে মানভূমির বীরহোড় বা জঙ্গলের মানুষ। বীরহোড় একটি সাঁওতালি শব্দ। 'বীর' শব্দটির অর্থ হল জঙ্গল এবং 'হোড়' শব্দের অর্থ মানুষ। সাঁওতালদের পাশাপাশি বসবাস করেও এরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রায় ২২-২৩ বছর আগে বীরহোড় সম্প্রদায়কে দেখা যেত বাগমুন্ডি থানার অন্তর্গত বুকাডি, বাড়েরিয়া, সোনকুপি, চিকনবাগান গ্রামের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে। এছাড়াও এর পূর্বে এদের বসবাস ছিল অযোধ্যা অঞ্চলের শিলিংদা, সাপারামবেড়া, ভুঁদাই গ্রামে। বর্তমানে বাগমুন্ডি থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে এদের নতুন আবাসস্থল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে গোবিন্দপুর গ্রামের কাছাকাছি ভূপতিপল্লীতে। ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ সমিতির তৎকালীন মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার এই পল্লীর উদ্বোধন করেন। ওঁর নামানুসারে এই পল্লীর নামকরন হয় ভূপতিপল্লী। বর্তমানে বাগমুন্ডি থানায় বীরহোড় পরিবারের মোট সংখ্যা ৩৯ টি। ভূপতিপল্লীতে রয়েছে ২৯ টি পরিবার, বাড়েরিয়াতে ৭টি পরিবার এবং বাড়েডিতে ৩টি পরিবার। আসলে তারা এমনভাবে ঘরদোর তৈরি করে যাতে এক জায়গায় থাকতে না হয়। তাদের ঘরের জিনিসপত্র বেশি থাকে না। দু একটি হাঁড়ি, কলসি, থালা, ছেঁড়া কাপড়, তীর ধনুক, বুনোলতার জাল, কুঠার, দু-একটি ছাগল, মুরগি ইত্যাদি। ভূপতিপল্লীর এক বৃদ্ধ রামু শিকারি

বলেন আমি মোট ৩০ জায়গায় বসবাস করে এসেছি।

তাদের জাতিগত পেশা হল শিকার, বনলতা দিয়ে দড়ি তৈরি, মধু সংগ্রহ করা। শিকার করে তারা হরিণ, বন্য শুকর, খরগোশ, সজারু এছাড়াও ছোট ছোট জন্তু জানোয়ার। শিকারের জন্য বেশ কাজে লাগে তাদের পোষা কুকুর। অনেক সময় অভাবের তাড়নায় শিকারের মাংস তারা গোপনে বিক্রি করে এবং শিকার কাজটিও বেশ গোপনভাবেই সম্পন্ন করে। এতসব করেও তাদের দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় হয়নি।

পুরুষকেন্দ্রিক পরিবার তাই সেখানে পিতা সর্বকর্তা। তারা পড়াশোনা করে না বললেই চলে। খুব জোর ছেলেরা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে। তারপর তারা বাগালি করে জমিদার ঘরে। একমাত্র সেই পল্লীতে উমেশ শিকারি পিয়নের কাজ করেন, অন্যান্য শিকারিদের তুলনায় তার অবস্থা কিন্তু ভালো। এক জায়গায় বসবাসকারী পরিবারগুলো নিজেরা মিলে একটি দল তৈরি করে। সেই দলের একজন দলনেতা নির্বাচিত হয়। দলনেতাকে বলা হয় নায়া। নায়ার কাজ হল সমাজে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজাপাঠ প্রভৃতি কাজকর্মকে পরিচালনা করা। নায়াকে কাজে সাহায্য করার জন্য আর একজন লোককে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও সমাজের প্রয়োজনে পরিবারের সকলকে এক জায়গায় নিয়ে আসার জন্য আর একলোকের প্রয়োজন পড়ে তার নাম গড়াত। এর কাজ হল সমস্ত খবর প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। এসব কাজে পারিশ্রমিক হিসেবে কোন কিছুই পায় না।

শিশু জন্মানোর পর তাদের নানান নিয়ম-রীতির প্রচলন দেখা যায়। অশৌচ, নারতা এইসব সময়মতো হয় এবং সময়ের মধ্যেই শেষ হয়। এই সম্প্রদায় কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত যথা কামার, লাকুর চাটা, সাঁওরিয়া, টুডু, মাহালি, হেমব্রম, ইন্দুয়ার প্রভৃতি। একই গোত্রের ছেলে মেয়ের মধ্যে কিন্তু বিবাহ হয় না। বিয়েতে পন নেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। পন হবে কম করে সাড়ে বারো টাকা। বিয়ের বয়স হলে পাত্রপক্ষ পাত্রীকে দেখতে যায়। পাত্রী দেখার সময় ঘটক হিসেবে কোনো এক ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করেন। তারপর নানা রীতি-নীতির মাধ্যমে একসময় বিয়ে হয়।

শরীর খারাপ হলে এরা ওঝার কাছে যায়। সেই ওঝার কবিরাজি ঔষুধের ওপর ভর করে রোগ সারে। আবার তারা ডাইনি বিষয়টিকেও বিশ্বাস করে। সাপের কামড়ে কেউ মারা গেলে বলে মনসা দেবীর কোপে পড়েছে। পল্লীতে কলেরা বা বসন্ত রোগ দেখা দিলে বলে দেবতাদের আক্রোশে পড়েছে। সেই দেবতাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নানা মানত করে ফেলে

তারা। পল্লীতে কোন ব্যক্তি মারা গেলে নেমে আসে সকলের মধ্যে শোকের ছায়া। আড়াআড়ি কিছু কাঠের টুকরো দিয়ে মই তৈরি করে মৃতদেহটিকে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঝর্না বা নদীর ধারে। সেখানে মৃতদেহটিকে কবর দেওয়া হয়। মৃতদেহটাকে মাটির গর্তে শোয়ানোর পর সকলে বলে-এখানে তোমার মাটি ছিল, তুমি থাকো, আমাদের যেন কোন কিছু বিঘ্ন না হয়। মৃতদেহকে না পুড়িয়ে কবর দেওয়ার পিছনে এক কাহিনী রয়েছে, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধও করা হয়।

বীরহোড় সম্প্রদায়ের ভাষা হল সাঁওতালদের মতোই। তবে কিছু হেরফের আছে। তারা বিশ্বাস করে হিন্দু দেবদেবীকে এবং পূজাও করে। মূল দেবতা হল তাদের 'পাহাড়'। তারা বিশ্বাস করে যে মকর সংক্রান্তি হল বর্ষশেষ এবং বর্ষ শুরু হয় ১লা মাঘ। তাই এদের কাছে বছরের গোড়াতেই 'বুরু' অর্থাৎ পাহাড়কে পূজা করার নিয়ম আছে। পূজার দিন সারা পাড়া মহানন্দে মুখর হয়ে ওঠে। পূজার জন্য নাইয়া স্নান করে, ভেজা কাপড়ে পূজার উপকরন নিয়ে যায়। গড়াৎ পাড়ার সকলকে জানিয়ে দেয় পূজার জন্য আসতে। আলপনা আঁকা হয়, সিঁদুর দেওয়া হয়, এরপর নায়া একমনে পূজায় বসেন। তাকে সাহায্য করে পাহান। প্রথমে পূজো হয় কুলদেবতা সূর্যের। তারপর শুরু হয় মারাংবুরু (বড় পাহাড়), চিপড়িং বুরু (ছোট পাহাড়), বাঙ্গা বুরু (দেবতার পাহাড়) প্রভৃতি। পুজোতে দুধ, মদ, হাড়িয়া, পশু বলি দেওয়া হয়। বুরু পূজার পর আসে সারুল (বসন্ত) পূজা, তারপর সহরাই পূজা, শিবের আরাধনা এবং অযোধ্যা পাহাড়কে এরা তীর্থক্ষেত্র বলেই মনে করত।

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলোকে তারা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা গান করে। ঐ গানে ভেসে উঠে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-বিরহ এমনকি সমান্তরাল মানসিকতার পরিচয়। বলা যায় পুরুলিয়া শহরের বাড়িগুলির প্রতি তাদের বেশ মনোযোগ ছিল কিন্তু সেগুলো তারা তৈরি করতে অসমর্থ ফলে নিজেদের অবস্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকাটা বাঞ্ছনীয়, সেই বিষয় একটি গানে ফুটে উঠেছে-

"পুরুলিয়া বাজারে নেল কানা কাকি কতম কড়া
কানা কাকি ঝ্যক ঝ্যক, জর কানা কাকি ঝারা বারা,"[৩]

বর্তমানে যাযাবর জীবন-যাপন ছেড়ে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। আর্থিকতার দিক থেকে নিম্নে হলেও টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে তারা।

সাঁওতাল :

পুরুলিয়া তথা মানভুমের যে সমস্ত জাতি বর্তমানে নিজেদেরকে সভ্যতার আলোয় তুলে ধরার

চেষ্টা করছে নিজস্ব কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে-সে জাতির নাম হল সাঁওতাল জাতি। সাঁওতাল শব্দটি কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে নানা গুণীর নানান মত। কেউ কেউ মনে করেন ‘সাঁত’ বা ‘সামন্ত’ থেকে হিন্দিতে ‘সাঁওতাল’ শব্দটি এসেছে। আবার অনেকেই বলেছেন ‘শ্যামতাল’ থেকে ‘সাঁওতাল’ শব্দটি এসেছে। সাঁওতাল পুরুষদেরকে বলা হয় ‘মাঝি’, মহিলাদেরকে ‘মেঝেন’ বলতেও আমরা শুনে থাকি। ‘মাঝি’ শব্দটির মাধ্যমে সাঁওতালদের সমাজে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিকে বোঝায়। তারা নিজেদেরকে ‘হড়’ জাতি বলেও পরিচয় দেন। ‘হড়’ শব্দের অর্থ হল মানুষ। এই জাতির আদি বাসস্থান ছিল হিহিড়ি পিপিড়ি নামে এক জায়গায় যা ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছিতে অবস্থিত। কথিত আছে জন্মগ্রহণ করার পর হারাতা পর্বতে তারা মিলিত হয় এবং সাসাংবেড়ায় তাদের গোত্র বিভাজিত হয়। পরবর্তীকালে তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

মোট বারোটি পদবী রয়েছে সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীতে সেগুলি হল- কিস্কু, মান্ডি, হাঁসদা, মুরমু, হেমব্রম, সোরেন, টুডু, বাস্কে, বেসরা, চঁড়ে, বেদিয়া, পাঁওরিয়া। খুব কম সংখ্যক সাঁওতাল দেখা যায় বেদিয়া, চঁড়ে, পাঁওরিয়া পদবীগুলোতে। তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন প্রতিটি পদবীর অনেক ধরনের উপ-পদবী আছে।

সাঁওতাল জনসাধারণ তাদের প্রধান নির্বাচিত করেন কোন ভোটের মাধ্যমে নয়, সকলে মিলে যার উপর খুব বেশি ভরসা পায় তাকে। এইভাবে তারা গ্রাম প্রধান মাঝি বা মোড়লকে প্রতিষ্ঠিত করে। মাঝির কাজ হল গ্রামের সমস্ত রকমের সমস্যার সমাধান করা, তার উপর আর কেউ নেই। মাঝির সঙ্গে বেশ কয়েকজন থাকে যাদের নিজস্ব কিছু কাজ থাকে গ্রামে। তারা হল পারানিক, জগমাঝি, জগ-পারনিক, গডেত, নায়কে, কুর্ডাম নায়কে।

পারানিকের কাজ হল মাঝির অনুপস্থিতিতে গ্রামের সর্বময় কর্তার অধিকারী হওয়া। জগমাঝির কাজ হল গ্রামের ভবিষ্যৎ যারা অর্থাৎ যুবক-যুবতীদের সঠিক পথ দেখানো। জগমাঝিকে সর্বময় কাজের সাহায্য করাই হল জগ-পারানিকের কাজ। মাঝির এক প্রকার দূত বলা যায় গডেতকে। যেকোন সভায় তার কাজ হল গ্রামের সকলকে এক জায়গায় ডেকে আনা। গ্রামের যাবতীয় পূজা-পার্বণ করেন নায়কে। আবার নায়কের সাহায্যকারী হল কুর্ডাম নায়কের। কোনো জটিল সমস্যার সমাধান যখন মাঝি করতে পারেন না তখন তা চলে যায় পারগানার কাছে। কয়েকটি গ্রাম মিলে হয় পরগনা এবং পরগনার শাসনকর্তাকে বলা হয় পারগানা। প্রত্যেকটি পরগনায় একটি দেশ মাঝি থাকে। সমস্ত পরগনার কথা ভাবনা চিন্তা করাই হল এই দেশমাঝির কাজ। আবার জাতীয় শিকারে যারা অংশগ্রহণ করে তাকে বলে দিহরি।

কোল বা মুন্ডা গোষ্ঠীর দুটি ধারা পূর্বাঞ্চলীয় এবং পশ্চিমাঞ্চলীয়। পূর্বাঞ্চলীয় ধারায় রয়েছে মোট ছয়টি ভাগ। যথা- কোডা, হো, ভূমিজ, মুন্ডারী, কোরোয়া এবং সাঁওতাল। বর্তমানে ভারতবর্ষের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অধিক। স্বাধীন ভারতের সাঁওতাল ভাষাঞ্চল দু'ভাগে বিভক্ত যথা- Northern Santali এবং Southern Santali. আসলে সাঁওতালি ভাষাভাষি মানুষ দেখা যায় উড়িষ্যা, ময়ূরভঞ্জ, হাজারিবাগ, সিংভূম, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ প্রভৃতি জায়গায়। ১৯২৫ সালের রঘুনাথ মুরমু এই ভাষার উপযোগী ‘অলচিকি’ লিপির উপর জোর দেন। এই লিপি অনেকদিন পর্যন্ত অবহেলিত ছিল। পরবর্তীকালে ‘আদিবাসী সোসিও এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশন’-এই লিপি প্রচারের জন্য আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৯ সালে এই লিপি নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেন। তারপর থেকে এই লিপির জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জায়গায়। বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় অনেক বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠানের চিত্র। এমনকি অনেক মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষায় বি.এ ও এম.এ পড়ানো হয়।

সাঁওতাল সমাজে একটি কথা বেশ প্রচলিত আছে, তা হল- লেখার থেকে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই বোধহয় সাঁওতাল সাহিত্য শ্রুতির আকারেই চলে আসছে। তাদের জীবনের মূল ঐতিহ্য হল বাড়ির দেয়ালে, গরু মহিষের শরীরে বিভিন্ন সাংকেতিক চিত্র অঙ্কন করা। সাঁওতাল সাহিত্য রচনা শুরু হয় মানুষের মুখে মুখে, যাকে আমরা লোকসাহিত্য নামে চিহ্নিত করি। লোকসাহিত্য বলতে আমরা জানি গীত, ছড়া, প্রবাদ, হেঁয়ালি, প্রবচন ও নানান ধরনের কাহিনি। এগুলো আলোচিত হত সন্ধ্যায় প্রতি ঘরে ঘরে ঠাকুরদা বা ঠাকুরমা তাদের নাতি-নাতনিদের সঙ্গে। বর্তমানে যদিও এই চিত্রটির প্রমাণ আর দেখা যায় না। লিখিত সাহিত্য এই সমাজে শুরু হয় ইংরেজরা আসার পর থেকেই। প্রথমে ইংরেজরা এই সাহিত্যের ক্ষেত্র বিচরণ করলেও পরবর্তীকালে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পন্ডিতগণ কলম ধরেন। সাঁওতালদের মধ্যে প্রথম লেখনী ধরলেন সিংভূমের রামদাস টুডু রেসকা। তিনি রচনা করলেন ‘খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)। এটিই হল সাঁওতালদের প্রচেষ্টায় প্রথম পুস্তক। এরপর একে একে নামজাদা কবিগণ এই সাহিত্যে বিচরন করেন। যেমন শিলদার মহাকবি সাধুরাম চাঁদ মুরমু, হিকিম মুরমু, উড়িষ্যার পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু, পুরুলিয়ার রাজেন্দ্রনাথ মাঝি প্রমুখ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বিহার সরকারের তত্বাবধানে ‘হড় সম্বাদ’ নামে এক সাঁওতাল পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ‘পছিম বাংলা’

নামে একটি সাঁওতাল পত্রিকাতে অনেক অনেক কবি, লেখকগন হাত পাকাচ্ছেন। অসাঁওতাল বুদ্ধিজীবীগন সাঁওতাল সাহিত্যে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরছেন। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, সুধীর মিত্র, ডঃ পরিমল চন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এছাড়াও অনেকেই মনে করেন যে পুরুলিয়া হল সাঁওতাল সাহিত্যের উৎপত্তিস্থল। সাঁওতাল সমাজের বিখ্যাত কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু পুরুলিয়া জেলার লোক। তিনি রচনা করেন 'ভুর্কা ইপিল' (১৯৫৩), 'কুহুবাও' (১৯৬০), 'গাম-গঁদার' (১৯৬৭), 'লাহাঃহররে' (১৯৮৫), 'বিদাঃ বেড়া', 'সলম লটম', 'সঙ্গীতিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ বহুল জনপ্রিয়। এছাড়াও তিনি দুটো পত্রিকার সম্পাদনা করতেন 'খেরওয়াল আড়াং' এবং 'সুসার ডাহার' পত্রিকা। পুরুলিয়া থেকে যেসব সাঁওতাল পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলি হল ঝারনা, ডাহার, তেতরে, শিলি, উমুল, রায়নার, গিরু, যুগ ঝরনা প্রভৃতি। তবে এখনও 'সিলি' পত্রিকাটি সচল রয়েছে।

উপরিক্ত জনজাতিগুলোর যেসব দিক আমরা পরবর্তীকালে বিস্তারিতভাবে আলোচনায় তৎপর হব সেগুলি হল-

১। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো।

২। সামাজিক চিত্র।

৩। শিক্ষা-দীক্ষার হার।

৪। সাহিত্যে ফুটে ওঠা মুখগুলোর পরিচয়।

৫। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান।

তথ্যসূত্র

(১) সেন শ্রমিক, কিরীটি মাহাতো, লোকভূমি মানভূম, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৮

(২) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯

(৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯

তৃতীয় অধ্যায়

পুরুলিয়া জেলার সাহিত্যচর্চায় লোকসাহিত্যিকদের অবদান

(Purulia Jelar Sahityachorchay Lokosahityikder Abodan)

বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় সাহিত্যচর্চা বেশ জোর কদমেই চলছে। পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে দুই শ্রেণীর মানুষ সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছেন। একদল এখানের ভূমিপুত্র এবং অন্যদল চাকরিসূত্রে এখানের বাসিন্দা। তবে এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যচর্চায় গঠনশৈলীর পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। বর্তমানে সাহিত্যের যে রূপ তেমনটা আদিতে ছিল না। এই জেলার সাহিত্য বলতে বোঝাত লোকসাহিত্যকে। লোকসাহিত্য হল কথা, কাহিনি, সঙ্গীত, গাঁথা, প্রবাদ, প্রবচন, মন্ত্র, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি বিষয়গুলো। এগুলো সমস্ত মুখে মুখে রচনা এবং শুনে শুনে মনে রাখার চল ছিল। নির্দিষ্ট করে বলা খুব মুশকিল যে-কে কোন বিষয়গুলো রচনা করেছেন।

ছড়া হল আকারে ছোট মুখে মুখে রচিত অন্তমিল যুক্ত পদ্য। এগুলো সাধারণত চার পর্বের, শ্বাসাঘাত পড়ে, স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়। ছড়া অনেক ধরনের হয়, যেমন- উপদেশমূলক বা শিক্ষামূলক, আনুষ্ঠানিক ছড়া, শিশুদের জন্য ছড়া। এগুলোর আবার উপবিভাগ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি তুলে ধরলাম-

"খনা বলে ডেকে আন
রোদে ধান, ছায়ায় পান"। [১]

লোকসাহিত্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'ধাঁধা'। ধাঁধা হল প্রায় রূপক প্রকৃতির বিষয়। অন্তর্নিহিত অর্থ প্রতিফলন করাই হল ধাঁধার মূল রহস্য। এর বিষয় হয় অনেক ধরনের- ঘর-সংসার বিষয়ক, লতা-পাতা, ফুল-ফল, কীট-পতঙ্গ, শিল-নোড়া, পশু-পাখি, মানব জীবন, সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র প্রভৃতি। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

"বন থেকে বেরুলো টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে"।[২] -বলতো কী?

এটার উত্তর হল আনারস।

এইরকম ধাঁধাকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন জনশ্রুতি ধাঁধা।

শাব্দিক সংকেতের মাধ্যমে ধাঁধা পরিপূর্ণতা পায়। যেমন-

"কাসুন্দির সুন্দি ছাড়া
পাঠার ছাড়া পা।
লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া

কিনে আনগে তা"।[৩] - বলতো কী ?

এর উত্তর হল কাঁঠাল। অনুমান করা যায় প্রাচীন যুগে গুরু তাঁর শিষ্যদের এরকম হেঁয়ালির মাধ্যমে অনেক কিছু বলতেন। আসলে এগুলোর অর্থ গুরু এবং তাঁর দীক্ষিত শিষ্য ছাড়া আর কেউ যেন বুঝতে না পারে তার ব্যবস্থার জন্যই হয়তো করতেন। এই বিষয়গুলোই পরবর্তীকালে লেখকগণ তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিচ্ছেন।

'লোককথা' হল লোক সাহিত্যের এক বড় উপাদান। এককথায় মুখে মুখে প্রচলিত নানান গল্পকেই বলা হয় কথা। যেগুলো নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের কাছে প্রচলিত মৌখিক গল্পগুলিই লোককথা। বাংলায় লোককথাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-উপকথা, রূপকথা, পশুকথা, ব্রতকথা। এই কথাগুলোর নির্দিষ্ট পাথুরে প্রমান নেই। তবে কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে একান্তভাবে যোগ রয়েছে।

'প্রবাদ' এর ইংরেজি নাম হল Proverb। এক কথায় প্রবাদ সম্পর্কে বাংলায় বলা যায়- ছোট বাক্য কিন্তু অন্তরে রয়েছে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। প্রবাদ নানান ধরনের হয়। যেমন- একছত্রের, দুই ছত্রের, চার ছত্রের ইত্যাদি। এক ছত্রের প্রবাদের দুটি দৃষ্টান্ত হল-

১। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'।[৪]

২। 'মাটি বাপের নয়, মাটি হল দাপের'।[৫]

প্রবাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখতে পাই সেগুলি হল- সরলতা, সত্যতা, প্রাচীনতা, সংক্ষিপ্ততা, অলংকারিকতা, প্রয়োগ যোগ্যতা।

পুরুলিয়ার লোকসাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত হল ঝুমুর। ঝুমুরের উৎপত্তি থেকে এখনও তার গুণ সর্ব্বজনবিদিত। পুরুলিয়ার অনেক গ্রামে-গঞ্জের আনাচে-কানাচে ঝুমুর শোনা যায়। ঝুমুরের বিশিষ্ট কবি ও শিল্পীগন হলেন- ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, জগৎচন্দ্র, চামু কর্মকার প্রমুখ।

লোকসাহিত্যের রসদ নিয়ে একসময় জনজাতির প্রধান সাঁওতাল সম্প্রদায় সাহিত্যের জগতে পৌঁছান। সাঁওতাল সম্প্রদের মধ্যে প্রথম কলম ধরেছিলেন রামদাস টুডু রেসকা। এরপর একে একে নামজাদা কবিগণ এই সাহিত্যে বিচরণ করেন। যেমন শিলদার মহাকবি সাধুরাম চাঁদ মুরমু, হিকিম মুরমু, উড়িষ্যার পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু, পুরুলিয়ার রাজেন্দ্রনাথ মাঝি প্রমুখ। স্বাধীনতার পর থেকে বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে 'হড় সম্বাদ' নামে এক সাঁওতালি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দু একটি পত্রিকাতে লেখকগণ নতুন

করে কলম ধরেছেন। অসাঁওতাল বুদ্ধিজীবীগন সাঁওতাল সাহিত্য নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেছেন। পুরুলিয়া থেকে অনেক সাঁওতাল পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলি হল- ঝরনা, ডাহার, সিলি, গিরু, উমুল প্রভৃতি। এছাড়াও ভুমিজ, শবর, বীরহোড় জনজাতির নির্দিষ্ট কিছু লোকসাহিত্য রয়েছে। বর্তমানে পুরুলিয়ার সাধারন মানবজাতি নিয়ে যারা বেশ সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- সৈকত রক্ষিত, জ্যোৎস্না কর্মকার, বিমল লামা, সিরাজুল হক, সত্য গুপ্ত, সুবোধ বসুর যায়। পরবর্তীকালে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনায় সচেষ্ট হব।

<u>তথ্যসূত্র</u>

(১) পাল অনিমেষকান্তি, লোকসংস্কৃতি, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১০৮

(২) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯

(৩) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৯

(৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১১৩

(৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১১৩

চতুর্থ অধ্যায়

পুরুলিয়ার জনজাতি-ভিত্তিক লোকশিল্প ও সংস্কৃতির বিবর্তন

(Puruliar Jonojati-Vittik Lokosilpo O Sonskritir Biborton)

এই জেলার আদিম জনজাতির লোকশিল্প হল সবচেয়ে প্রাচীন। প্রথমত আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ বসবাস করত বনে-জঙ্গলে। বনের হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষার জন্য তারা প্রথমেই পাথরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করল। পাথর থেকেই তৈরি হল পরবর্তীকালে শিল-নোড়া, থালা-বাটি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তারপর লোহা, তামা, কয়লা পাওয়া গেল নানান খনিজ সম্পদ। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তারা তৈরি করল আত্মরক্ষার অস্ত্র-শস্ত্র, চাষবাসের সাজ-সরঞ্জাম, ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

এই জেলার প্রাচীন লোকশিল্পের মধ্যে অন্যতম হল মৃৎশিল্প। এই অঞ্চলের মানুষজন প্রথম দিকে মাটির হাঁড়িতে রান্না করত এবং মাটির পাত্রে ভাত খেত। সেই ভাতকে আবার নেশা হিসেবে ব্যবহার করত। যে কোনো সম্প্রদায়ের পূজা পার্বণ হোক না কেন মাটির পাত্র ব্যতীত অন্য কোন জিনিস ব্যবহৃত হত না। পূজোর জন্য মাটির প্রতিমা বানানো হত, সেই পূজোতেই হাঁড়ি, ঘট, কলসি প্রভৃতি ব্যবহার আবশ্যক ছিল। বিভিন্ন পূজোর জন্য মাটির হাতি, ঘোড়া, মুড়ি ভাজার জন্য মাটির পাত্র, জল রাখার কলসি, হাঁড়ি, ধান সিদ্ধ করার জন্য বড় বড় হাঁড়ি, পিঠে তৈরি করার জন্য সরা-এই সমস্ত মাটি দিয়েই তৈরি হত। মৃত্যুর পর শ্মশানঘাট থেকে শ্রাদ্ধের যাবতীয় কাজকর্ম মাটির তৈরি জিনিসপত্র দ্বারাই হয়। এই জেলার মানুষের জীবনের সঙ্গে মাটি যেন এক অনবদ্ধ সুতার বন্ধনে আবদ্ধ। এছাড়াও মৃৎশিল্পের একটি বিরল দৃষ্টান্ত হল চড়িদার মুখোশ শিল্প। অনেক ধরনের মুখোশ চড়িদাতে পাওয়া যায়। মুখোশ শিল্প পূর্বে এক সময়সাপেক্ষ বিষয় ছিল। প্রথমেই একটি সাঁচ তৈরি করতে হয়। সাঁচ বলতে মুখোশ তৈরি করার অবয়বকে বোঝায়। সেই সাঁচের উপর ছাইয়ের সঙ্গে আঠা সহযোগে কাগজকে বা মাটির ঘোল তৈরি করে চার বা পাঁচ স্তর দেওয়া হয় এবং শুকনো করা হয়। শুকনোর পর তার ওপর পলিমাটি দিয়ে আরো পুরু করা হয়। সুতির কাপড় দিয়ে ঘোলা বা কাবিসের উপর ডুবিয়ে সেটাতে সেঁটে দেওয়া হয় এবং খোলা জায়গায় রাখা হয়। রাখার ফলে যখন এক-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায় তখন থাপি দিয়ে মূর্তিটিকে মসৃণ করা হয়। আবার রোদে রাখা হয়। যখন পুরোপুরি শুকে যায় তখন সাঁচটিকে খুন্তি দিয়ে খোলা হয় এরপর ভেতর দিকে শুকানো হয়। পুরোপুরি শুকনোর পর সুতি কাপড় দিয়ে মোছা হয়। কাগজ, আঠা সহযোগ লাগানো হয় এবং রং করা হয়।

মুখোশ তৈরি করা হয় দুটো পদ্ধতিতে যথা কঙ্কাল ও পাথরকাটা পদ্ধতি। কঙ্কাল পদ্ধতি বলতে বোঝানো হয় প্রথমে মাটি দিয়ে নাক, কান, চোখ, ঠোঁট বানানোর পর দুদিকে আবার কিছু মাটি

দিয়ে একটি অবয়ব গঠন করা। এই পদ্ধতিতে বেশিরভাগ মুখোশ তৈরি হয় চড়িদাতে। পাথর কাটা পদ্ধতিটি হল- একটি মাটির মন্ড নিয়ে তাকে ছেঁটে ছেঁটে একসময় মুখের অবয়ব নিয়ে আসা। এই পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়নি মুখোশ তৈরিতে। বর্তমানে একটি মুখের অবয়ব অর্থাৎ ‘ডাইস’ নামে পরিচিত তা বাজারে পাওয়া যায়। এই ডাইসের উপর আঠা দিয়ে কাগজ আটকানো হয় এবং হালকা মাটি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাকে শুকানো করা হয়। ফলে অতি সহজেই তা মূর্তির আকার ধারন করে। এই পদ্ধতিতে কম সময়ে অধিক মুখোশ বানানো হয়। পূর্বে মুখোশ সাজানোর জন্য ময়ূর পালক, বকের পালক, মালা, নানান ধরনের কাগজ পাওয়া যেত। বর্তমানে এইগুলো সমস্তই পাওয়া যায় প্লাস্টিকের। বাজারে চাহিদা অনুযায়ী এখন মুখোশ তৈরি করা হচ্ছে। তাতে মুখোশ চাকচিক্য বেশি থাকছে, কম সময়ে বেশি তৈরি করা হচ্ছে। ফলে অনেক কম সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মুখোশ রপ্তানি করা হচ্ছে। আবার মুখোশ শিল্প দেখা যায় জয়পুর, পুরুলিয়ার এক নম্বর ব্লকেও।

আবার কিছু কিছু জনজাতি তাদের পেশাগত জীবিকা হিসেবে ব্যবহার করে বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র। বাঁশ থেকে তৈরি করে তারা ঝুড়ি, কুলা, ঝাঁটা, ডালা, চালাঘরের দরজা, ধান রাখার ডেমনি, মাছ ধরার বঁড়শি, কলমদানি, ঘর সরঞ্জামের টুকটাক জিনিসপত্র ইত্যাদি। গরুর গাড়ি বানানোর সময় বাঁশের উপযোগিতা খুব বেশি প্রচলন ছিল।

এই জেলার মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে কাঠকে বেশ কাজে লাগিয়েছে। হস্তশিল্পের মধ্যে কাঠ এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। কাঠ দিয়ে তৈরি করে এখানকার মানুষজন ঘরের দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, দেব-দেবীর মূর্তি, ঘর সাজানোর উপকরন, খাট ইত্যাদি। এছাড়াও আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন-ঢাক, ঢোল, নাগরা, ধামসা ইত্যাদি কাঠ থেকেই তৈরি হয়।

হস্তশিল্পে যেমন পুরুষেরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তেমনি মহিলারাও নিজেদের স্বাক্ষর রেখেছে জোর কদমে। মহিলারা শাল গাছের পাতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে পাতা (পতরী) ও কৌটা-যা সব ধরনের ভোজনে কাজে লাগে। এছাড়াও বিড়ি শিল্পে মহিলাদের ভূমিকা একেবারে অনস্বীকার্য। ঝালদা থানার বেশিরভাগ মেয়ে মানুষের কাজ হল সকালে স্নান করে তামাক ও বিড়ির পাতা নিয়ে বিড়ি তৈরি করা। যার জন্য সেই এলাকায় ধান চাষ ব্যতীত অন্যান্য চাষবাস খুব একটা চোখে পড়ে না। এছাড়াও মহিলারা তৈরি করে চাটাই বোনা, ঝাঁটা তৈরি, হাত পাখা বানানো, কাপড়ে নানা রকমের নকশা, বসার আসন, বাঁশের ছাতা,

ফুলদানি ইত্যাদি।

লোক শিল্পের অন্যতম দৃষ্টান্ত হল ঝালদা শহরের আগর শিল্প। এই শিল্পের প্রথম প্রবর্তক হলেন শ্রী গৌউর মোহন কর্মকার। ঝালদায় তৈরি আগর প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এখানকার আগর, বাটালি, ছুরি, কাঁচি, গুপ্তি, কোদাল, বঁটি এছাড়াও লৌহজাত শিল্প ভারত বিখ্যাত। বাজারে যেদিন থেকে গ্রিল মেশিনের আবির্ভাব হল সেদিন থেকেই কোথাও যেন আগরের ব্যবহার কমতে থাকল। অথচ একসময় দেশে-বিদেশে প্রচুর পরিমাণে আগর রপ্তানি করা হত। আবার অনেক কর্মকারের অভিমত যে লকডাউনের পর থেকে অনেকটাই ধ্বসে গেছে এই শিল্প। সরকার কর্তৃপক্ষ যদি এই শিল্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে এই শিল্প বেঁচে থাকবে।

অপর এক গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প হল লাক্ষা শিল্প। এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন পারস্যের গ্রাম থেকে আসা এক যুবক যার নাম এ. এম. আরাথুন সাহেব। তিনি ১৮৯৭ সালে ঝালদাতে এসে একটি লাক্ষা শিল্পের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেন এ. এম. আরাথুন প্রাইভেট লিমিটেড। আসলে ঝালদা, তুলিন, বাঘমুন্ডি, বলরামপুর এই অঞ্চলে একসময় লাক্ষা চাষ বেশ নজরে পড়ত। লাক্ষা চাষের গোড়ার কথা হল এর কোনো চাষ হত না-বনে কোনো কোনো গাছের লাক্ষার বীজ পোকারা অন্যান্য কাছে এসে বসার পরেই গাছের প্রতিটা ডালে লার্ভা সঞ্চারিত হত। পরবর্তীকালে মানুষ বুঝতে পারে এর উপযোগিতা। বনে জঙ্গলে ঘোরা মানুষেরা নির্দিষ্ট সময়ে কুল, পলাশ, কুসুম, ডুমুর প্রভৃতি গাছে এই চাষ শুরু করে। তখন মূল্য কম ছিল কিন্তু অধিক পরিমাণে লাক্ষা চাষ হত। বর্তমানে লাক্ষার দাম খুব উচ্চে কিন্তু দিন দিন গাছপালা হ্রাস পাওয়া, সাথে সাথে ঘরবাড়ি বানানোর ধুমে, লাক্ষা চাষ মাঝারি মাপের দেখা যায়। ইদানিং দেখা যায় শুকনো লাক্ষা খুব বেশি দামে বিক্রি হয়। দিন দিন গাছপালার সংখ্যা হ্রাস, খামখেয়ালী আবহাওয়া এই চাষের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোকসংস্কৃতির উৎস ঠিক কবে থেকে তা নির্দিষ্টভাবে বলা খুব মুশকিল। আনুমানিকভাবে বলা যায় যে- আমাদের মানব সভ্যতা প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে লোকসংস্কৃতি গতি পায় নব্য প্রস্তর যুগে এবং পরবর্তীকালে মানুষ যখন চাষবাস করতে শিখল এবং হাতে এল কিছু বাড়তি সময়- সেই সময়কেই একাধারে লোকসংস্কৃতির উৎস বলা যেতে পারে। এই জেলার প্রান হল তাদের লোকসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির বাতাস প্রায় সমস্ত জনজাতির মধ্যেই প্রবাহিত হয়েছে। এই জেলার জনজাতিদের মধ্যে চলমান লোকসংস্কৃতিগুলি হল-

সঙ্গীত- টুসু, ভাদু, ঝুমুর, করম, কৃষি গীত, বিবাহ গীত ইত্যাদি।

নাচ- সহরাই নাচ, পাতা নাচ, মরদানি ঝুমুর নাচ, ঝুমুর নাচ, ছৌ নাচ, সরহুল নাচ, নাটুয়া নাচ, কাঠি নাচ ইত্যাদি।

বাদ্যযন্ত্র- বাঁশি, একতারা, গোপীযন্ত্র, নাগড়া, মাদল, ঢাক, ঢোল, করতাল, ডমরু ইত্যাদি।

সময়ের ঘেরাটোপে বা কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিগুলো ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দুই একটি বাদে সবগুলোই। বর্তমানে কি অবস্থাতে রয়েছে এই লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতি, এগুলোর জোয়ার ভাটার কারণ, জনজাতি-ভিত্তিক যেসব বিষয়গুলো প্রচলন জোরকদমে সেগুলো ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে উন্মোচন করাই হবে এই অধ্যায়ের আমার অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

পুরুলিয়ার কথ্যভাষা: সময়ের ছন্দে

(Puruliar Kothyovasa: Somoyer Chonde)

আমাদের জেলার সমাজ ও সংস্কৃতির যেমন একেবারে নিজস্ব তেমনিই এখানকার ভাব বিনিময়ের মাধ্যম ভাষা-তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার ভাষাকে নিয়ে পূর্বে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং বর্তমানেও নানান জায়গায় কমবেশি গবেষণা চলছে। অনেক গবেষক এই জেলার কথ্যভাষাকে গবেষণা করে নাম দিয়েছেন 'মানভুঁইয়া' ভাষা। এখানকার সাহিত্যেও এই ভাষা জোর কদমে উঠে আসছে এবং জনপ্রিয়তাও পাচ্ছে। ভাষার কেন্দ্রীয় বিষয় হল বৈচিত্র্যতা। একই এলাকার মানুষের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য আমাদের কানে ঠেকে। এক ভূখণ্ডে বসবাস করার ফলেও নানান জাতিগত ভাষার বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। আমাদের বাগমুন্ডি থানার অন্তর্গত সাঁওতাল, ভূমিজ, শবরদের নির্দিষ্ট ভাষা রয়েছে। এই জনজাতিগুলির ভাষা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি বাক্য বাংলাতে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম-

এক ছেলে তার বাবাকে বলল- বাবা আগামীকাল বিদ্যালয় ছুটি থাকবে। বিদ্যালয়ের ময়দানে বইমেলা হবে। আমি আগামীকাল কোনো কাজ করতে পারব না। সকাল থেকেই আমি বইমেলাই থাকব।

সাঁওতাল- মিটান গিদার আজ বাবায় মেতায় কানা বাবা কাপা দ ইস্কুল ছুটি তাহে না। ইস্কুল রেনাঃ ট্যাঁডিরে বই পরব হুয়া আ। ইঞ গাপা চেদ হঃ বাঞ কামিয়া। সেতাঃ খন ইঞ বই পরব রেঞ তাহে না।

শবর- মুই মোহর বাওকক বুন্নু- বাওকক কানহিরঅ ইস্কুল ছুটি থাকিবাক। ইস্কুল গোডাই বই পরব নাগিবাক। মুই কানহির কিসুই কাম কুরিম নাই। সাকাড় হতেই মুই বই পরব থাকিম।

এই অধ্যায়ে আমাদের মূল বিষয় হবে এক ভূখণ্ডে বসবাসের পরেও জাতিগত ভাষার যে হেরফের তা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে দেখানো।

<u>উপসংহার:</u>

শুধুমাত্র জেলার ইতিহাসে নয়, আদিম জনজাতির উপস্থিতি নিরিখে ভারতবর্ষের আদিম জনজাতির তথ্য ও ইতিহাসের রক্ষায় রাজ্য ও জেলার ভূমিকা অনতিক্রম্য। আর এই গৌরবে আমাদের আলোচ্য মানভূম জেলার উল্লেখ করতেই হবে। তাই মানভূম জেলার নির্বাচিত আদিম জনজাতির বিবর্তনের অনুসন্ধানে আমাদের এই গবেষণা কর্মের অবতারণা।

গ্রন্থপঞ্জি:

সহায়ক গ্রন্থ:

(১) আচার্য, নন্দদুলাল; রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৩

(২) ঘোষ, প্রদ্যোত; বাংলার জনজাতি (প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

(৩) চৌধুরী, কমল; পুরুলিয়ার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮,

(৪) জানা, দেবপ্রসাদ; (সম্পা)- অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (প্রথম পর্ব), দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩

(৫) তদেব, (দ্বিতীয় পর্ব), দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪

(৬) তদেব, (তৃতীয় পর্ব), দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪

(৭) দেওঘরিয়া, ব্রতীন; ঐতিহ্যে উত্তরাধিকারে পুরুলিয়ার ব্লক, চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০২২

(৮) দেবসেন, সুবোধ; বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

(৯) পান্ডা, বিজয়; মানভূম লোক সংস্কৃতির বিবিধ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খন্ড), অনুজ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০ শে জানুয়ারি ২০১০

(১০) পান্ডে, রবীন ও তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি, মনন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২৭শে ডিসেম্বর ২০১০

(১১) পাল, অনিমেষকান্তি; লোকসংস্কৃতি, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬,

(১২) পাল, মোহন; সাঁওতাল সমাজের বিবাহ ও বিবাহের গান, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬

(১৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯,

(১৪) বেরা, নন্দকুমার; ঝাড়খণ্ডের জনজাতি: সমাজ ও সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০২১,

(১৫) বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ; পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খন্ড), বাস্কে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৭,

(১৬) ভট্টাচার্য, তরুণ দেব; পুরুলিয়া, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬

(১৭) মন্ডল, দয়াময়; পুরুলিয়া লোকসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, গ্রন্থবিকাশ, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৭

(১৮) রায়, নীহাররঞ্জন; বাঙ্গালির ইতিহাস (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬

(১৯) সেন, সুকুমার; ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯

(২০) সেন, সুকুমার; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০,

(২১) সেন, শ্রমিক ও কিরীটি মাহাতো, লোকভূমি মানভূম, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৫

সহায়ক পত্রপত্রিকা:

(১) দাস, রমানাথ; (সম্পা), অড় পত্রিকা, জনজাতি বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা ২০০৪

(২) রায়, সুভাষ; (সম্পা) অনৃজু, ২৫ তম বর্ষ, শারদ সংখ্যা ১৪১৭, বর্ণালী

(৩) সরকার, প্রণব; স্বদেশচর্চা লোক, গোষ্ঠী, সমাজ, সম্প্রদায় ১, শারদ ১৪২০